৪. ইক্তা ব্যবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশের একাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য হিসাবে বিবেচিত হত। সুলতানী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইক্তাব্যবস্থার মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। আক্ষরিক অর্থে 'ইক্তা' বলতে বোঝায় 'এক অংশ'। এটি ছিল ভূমি বা ভূমিরাজস্ব যা একজন শাসক রাষ্ট্রের প্রতি সেবার পুরস্কার হিসাবে কোনো ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত হিসাবে দিতেন। ইসলামের একেবারে গোড়া থেকে এর অস্তিত্ব ছিল। খালিক আহমেদ নিজামী লিখেছেন, ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দিল্লীর আদি তুর্কী সুলতানগণ বিশেষ করে ইলতুতমিস ইক্তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। সদ্য বিজিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করা, সেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা, এই বহুমুখী সমস্যাবলীর সমাধান ইক্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই হয়েছিল।

একজন সুলতানের অধীনে দুধরনের জমি থাকত। একটি খালিসা বা সুলতানের খাস জমি। এই জমির রাজস্ব সরকারি আমলারা আদায় করত ও তা সরাসরি রাজকোষে জমা পড়ত। দ্বিতীয় ধরনের জমিকে বলা হত ইক্তা। এই জমি সুলতান নির্দিষ্ট শর্তে ও সেবার বিনিময়ে সেনাধ্যক্ষ, সৈনিক ও অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ইক্তার প্রাপকদের বলা হত 'মাক্‌তি'। কখনও বা তারা 'ওয়ালি' বা 'উলিয়ৎ' নামেও অভিহিত হত। সুলতানের ইচ্ছানুসারে তাঁর প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পিত হত মাক্‌তির ওপর। মাক্‌তির কর্তব্য ছিল সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ ও সুলতানের আদেশ মতো তাঁকে সেনা সাহায্য করা। ইক্তা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব এই কর্তব্য পালনের জন্যই মাক্‌তিকে ব্যয় করতে হত। ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন, মাক্‌তি ছিল একাধারে রাজস্ব সংগ্রহকারী এবং সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর বেতনপ্রদানকারী।

মহম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয়ের পর তাঁর অনুগামী সেনাপতিগণ তাদের দখল করা ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে এই স্বশাসিত ভূখণ্ডগুলিই 'ইক্তা' নামে পরিচিত হয় ও সেনাপতিগণকে মাক্‌তি বলা হয়। ইলতুতমিস প্রথম ইক্তাব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তিনি মাক্‌তিদের বিভিন্ন ইক্তায় বদলি করার নীতি গ্রহণ করেন। তাদের সুস্পষ্টভাবে সুলতানকে সামরিক সাহায্য করতেও বলা হয়। মাক্‌তি তার নিজস্ব ইক্তা থেকে ক্ষুদ্রাকার ইক্তা উপস্বত্ত্ব হিসাবে পছন্দমত ব্যক্তিকে দান করার অধিকারী ছিল। ইলতুতমিস তাঁর দুই বা তিন হাজার অশ্বারোহীকে গ্রামদান করেন, যাকেও 'ইক্তা' বলা হত। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন ইক্তা বণ্টনের পাশাপাশি ইলতুতমিস খালিসা জমি বৃদ্ধিরও চেষ্টা করেন। বস্তুত দিল্লী ও দোয়াবসহ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুলতানের খাস জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলতুতমিসের মৃত্যু ও গিয়াসউদ্দিন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সময়ে মাক্‌তিরা সুলতানকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করায় ইক্তাব্যবস্থা সুলতানীর দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহণের পর ইক্তা বিলি বন্দোবস্তের তদন্ত করেন। দেখা যায় ইক্তা প্রাপকদের অনেকেই মৃত অথবা বার্ধক্যের কারণে সামরিক সেবা প্রদানে অক্ষম। বলবন এই ইক্তাগুলি কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে এর ভোগ- দখলকারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। দিল্লীর কোতয়াল ফকরউদ্দিনের মধ্যস্থতায় সুলতান কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেন। বারাণীর রচনার ভিত্তিতে ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, যে দানগুলির পরিবর্তে যথাযোগ্য সেবা পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলি নয় প্রত্যাহার করা হয় আর নয় তার সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ইক্তার ওপর সুলতানের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য বলবন কিছু ব্যবস্থা নেন। বড় ইক্তার মালিক মাক্‌তিদের কর্তব্য ছিল ইক্তার 'ফাওয়াজিল' বা উদ্বৃত্ত অর্থ সুলতানের রাজকোষে জমা দেওয়া। কিন্তু তারা আয়-ব্যয়ের হিসাব এমন ভাবে তৈরি করত যে কখনই উদ্বৃত্ত হত না। বলবন 'খ্বাজা' নামে এক শ্রেণীর হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করে ইক্তার প্রকৃত আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখার ব্যবস্থা করেন।

আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকালে ইক্তা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময় সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পেলে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে ইক্তায় পরিণত করে সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হয়। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিকে খালিসায় রূপান্তরিত করা হয়। সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিকদের ইক্তার পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতনদানের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে খালিসা জমির রাজস্ব রাজকোষে জমা রাখা হত। তবে সেনাপতিদের ইক্তা প্রদানের রীতি অব্যাহত থাকে। ইক্তার ওপর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব তিনি সুদৃঢ় করেন। এখন স্থির হয় যে দিওয়ান-ই-ওয়াজারত বা অর্থদপ্তর প্রতি ইক্তার রাজস্ব বাবদ আয় স্থির করে দেবে। ইক্তার অনুমিত আয়ের একাংশ মাক্‌তির অধীনস্থ সৈনিকের বেতন বাবদ ব্যয় করা হবে। আর এক অংশ মাক্‌তির ব্যক্তিগত ব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সব রকম ব্যয় সংকুলানের পর উদ্বৃত্ত অর্থ সুলতানী রাজকোষে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। মাক্‌তিরা সাধারণত তাদের আয় গোপন করত। তারা আবার তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনত। আলাউদ্দিনের মন্ত্রী শরাফ কাই সবস্তরে ইক্তার হিসাব পরীক্ষা করতেন। তহবিল তছরূপের অভিযোগ পেলে মাক্‌তি থেকে শুরু করে পাটোয়ারী বা গ্রামীণ হিসাবরক্ষক সকলকেই কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। এর ফলে ইক্তার অনুমিত আয় বৃদ্ধি পায়।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ইক্তার ব্যাপারে কোনো বড়ো পরিবর্তন আনেননি। দিওয়ান-ই-ওয়াজারত প্রতি বছর ইক্তার আয়ে যে বৃদ্ধি ঘটাতো তা তিনি বন্ধ রাখার আদেশ

দেন। কারণ এই বৃদ্ধির বোঝা মাক্‌তি কৃষকের ওপর চাপাতো। ইক্তার যে অংশের আয় সেনাবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট থাকত সেখান থেকে মাক্‌তির কিছু নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে ইক্তার ওপর সুলতানী নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সংগ্রহ ও সেনা রক্ষণাবেক্ষণ, এ দুটি কাজকে পৃথক করার কাজ শুরু হয়। সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইক্তার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষে এইভাবে ইক্তার ওপর ইজারাদারী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ইজারাদারদের ওপর সেনা ভরণপোষণ ও সেনা সরবরাহের কোনো দায়িত্ব বর্তাতো না। মামালিক-আল-আবসার নামে এক আরবী গ্রন্থে বলা হয়েছে, একশো সেনার কম দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতি থেকে শুরু করে দশ হাজার সেনার সেনাপতি পর্যন্ত সকলেই বেতনের পরিবর্তে ইক্তা লাভ করত। অতএব সৈনিকদের বেতনদানের দায়িত্ব সেনাপতির আর থাকে না। এখন থেকে ইক্তা বলতে শুধুমাত্র সেনাপতির ব্যক্তিগত বেতনই বোঝাতো। ইরফান হাবিব মনে করেন মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে আমিরাণ-ই-সদাহ্ বা সদা আমীরদের বিরোধের মূলে ছিল এই ব্যবস্থা যেখানে সেনাপতিদের ইক্তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ফিরুজ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করে অভিজাতবর্গকে নানা রকম সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে ইক্তাব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব পড়ে। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় 'খান' পদমর্যাদার একজন সেনাপতির বেতন ছিল তিন লক্ষ তঙ্কা। ফিরুজ তুঘলক 'খান' ও 'মালিক' পদমর্যাদার সেনাপতির ব্যক্তিগত বেতন বৃদ্ধি করে চার, ছয় ও আট লক্ষ করেন। ওয়াজিরের বেতন ধার্য হয় তেরো লক্ষ তঙ্কা। এই বেতনের পরিবর্তে তাদের স্বতন্ত্র ইক্তা ও পরগণা প্রদান করা হত। মাক্‌তিরা খুশী হয় কারণ সুলতানকে দেয় রাজস্ব আর বৃদ্ধি পাবে না। হিসাব পরীক্ষার বিষয়টিও শিথিল হয়ে পড়ে। আইনত ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্ত ইক্তা ও সেনা ভরণপোষণের নির্দিষ্ট ইক্তা পৃথক ছিল। কিন্তু ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন, কোনো নিয়ন্ত্রণবিধির অভাবে এই পৃথকীকরণ ক্রমশই নামমাত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ফিরুজ তুঘলক যে ভাবে অভিজাতবর্গের মধ্যে ইক্তা বণ্টন করেছিলেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে এর ফলে খালিসা জমির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে 'ওয়াজব' বা নির্দিষ্ট গ্রামে রাজস্ব প্রদান করা হয়। যাদের 'ওয়াজব' দেওয়া সম্ভব হত না তাদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হত। ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে কোনো মাক্‌তির মৃত্যু হলে সেই ইক্তা তার পুত্র ভোগ করার অধিকারী হয়। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, ওয়াজব প্রাপ্ত সৈনিকের মৃত্যু হলে তা তার পুত্র, পুত্রের অবর্তমানে জামাতা, ক্রীতদাস ও তার বিধবা পত্নীর হাতে ন্যস্ত হত।

ফিরুজ তুঘলকের পরবর্তীকালেও ইক্তার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব হয়নি। ১৪২২ খ্রীঃ-এ সৈয়দ সুলতান মুবারক শাহ জনৈক অভিজাতকে লাহোরে ইক্তা প্রদান করেন দু'হাজার সৈন্য ভরণপোষণের শর্তে। এক ইক্তা থেকে অন্য ইক্তায় বদলির দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তবে সাধারণ ভাবে সৈয়দ বংশের শাসনকালে ফিরুজ তুঘলকের সময়কার নীতিই অনুসৃত হয়। লোদী শাসনকালেও ইক্তাব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। তবে ইক্তা শব্দটি অন্তর্হিত হয়। তার স্থলে 'সরকার' ও 'পরগণা' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হতে থাকে। কতকগুলি পরগণা নিয়ে একটি সরকার গঠিত হত যা কোনো অভিজাতকে ইক্তা হিসাবে প্রদান করা হত। তিনি আবার সরকারের কিছু অংশ বা পরগণা কোনো অধীনস্থের কাছে বিলি-বন্দোবস্ত করতে পারতেন। লোদী শাসনের সামগ্রিক

দুর্বলতা সত্ত্বেও পুরনো ইক্তাব্যবস্থার ন্যূনতম কাঠামোটি অটুট থাকে। এটি উত্তরাধিকার সূত্রে মুঘলদের হাতে যায় যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জাগীরদারী ব্যবস্থা।